চিরায়ত

আরণ্যক

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

KOBI PROKASHANI

আরণ্যক
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৬
প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫
স্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা
নান্দীমুখ
শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী
বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন
মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১
ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ৪২০ টাকা

Aronyak a novel by Bhibhutibhushan Bandyopadhyay
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: September 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price BDT 420 RS 420 US$ 20
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

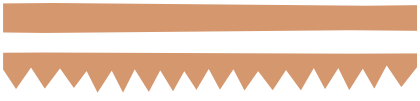
ISBN: 978-984-97683-7-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১





গৌরীকে দিলাম





বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্ষরের তুলিতে এঁকেছেন, বাংলার রূপ। মিশেছেন অরণ্যের গহিনে, প্রকৃতির অমৃতপুত্রদের সঙ্গে। বিশ্বাস করতেন, গতিই জীবন, গতির দৈন্যই মৃত্যু। অসীম বৈরাগ্যে পৃথিবীকে দেখেছেন 'অপরাজিত' এই লেখক। কলকাতার কল্লোল ছেড়ে ফিরেছেন পল্লির শান্ত জীবনে, অপুর বিস্ময়ে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণার মুরাতিপুরে জন্ম, ১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। লিখেছেন কালজয়ী 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক' এবং 'চাঁদের পাহাড়'। 'পথের পাঁচালী' প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন—'বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে।' বাংলা উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণ ও দিনলিপি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম রূপকার, মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত বিভূতিভূষণের আখরে পাঠকের প্রবেশিকা হয়েছে অরণ্যপ্রকৃতি ও বাংলার নিবিড় জীবনবোধে। ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর তাঁর জীবনাবসান হয়।

আরণ্যক

প্রস্তাবনা

সমস্ত দিন আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে গড়ের মাঠে ফোর্টের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া ছিলাম।

নিকটেই একটা বাদামগাছ, চুপ করিয়া খানিকটা বসিয়া বাদামগাছের সামনে ফোর্টের পরিখার ঢেউখেলানো জমিটা দেখিয়া হঠাৎ মনে হইল যেন লবটুলিয়ার উত্তর সীমানায় সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া আছি। পরক্ষণেই পলাশি গেটের পথে মোটর-হর্নের আওয়াজে সে ভ্রম ঘুচিল।

অনেক দিনের কথা হইলেও কালকার বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতা শহরের হইচই কর্মকোলাহলের মধ্যে অহরহ ডুবিয়া থাকিয়া এখন যখন লবটুলিয়া বইহার কি আজমাবাদের সে অরণ্য-ভূভাগ, সে জ্যোৎস্না, সে তিমিরময়ী স্তব্ধ রাত্রি, ধু-ধু ঝাউবন আর কাশবনের চর, দিগ্বলয়লীন ধূসর শৈলশ্রেণি, গভীর রাত্রে বন্য নীল-গাইয়ের দলের দ্রুত পদধ্বনি, খররৌদ্র-মধ্যাহ্নে সরস্বতী কুণ্ডীর জলের ধারে পিপাসার্ত বন্য মহিষ, সে অপূর্ব মুক্ত শিলাস্তৃত প্রান্তরে রঙিন বনফুলের শোভা, ফুটন্ত রক্তপলাশের ঘন অরণ্যের কথা ভাবি, তখন মনে হয় বুঝি কোনো অবসর-দিনের শেষে সন্ধ্যায় ঘুমের ঘোরে এক সৌন্দর্যভরা জগতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীতে তেমন দেশ যেন কোথাও নাই।

শুধু বনপ্রান্তর নয়, কত ধরনের মানুষ দেখিয়াছিলাম।

কুন্তা...মুসম্মত কুন্তার কথা মনে হয়। এখনও যেন সুংঠিয়া বইহারের বিস্তীর্ণ বন্যকুলের জঙ্গলে সে দরিদ্র মেয়েটি তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া বন্যকুল সংগ্রহ করিয়া তাহার দৈনন্দিন সংসার-যাত্রার ব্যবস্থায় ব্যস্ত।

নয়তো জ্যোৎস্না-ভরা গভীর শীতের রাত্রে সে আমার পাতের ভাত লইবার আশায় আজমাবাদ কাছারির প্রাঙ্গণের এক কোণে, ইঁদারাটার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

মনে হয় ধাতুরিয়ার কথা...নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া!...

দক্ষিণ দেশে ধরমপুর পরগনার ফসল মারা যাওয়াতে ধাতুরিয়া নাচিয়া গাহিয়া পেটের ভাত জুটাইতে আসিয়াছিল, লবটুলিয়া অঞ্চলের জনবিরল বন্য গ্রামগুলিতে...চীনা ঘাসের দানা ভাজা আর আখের গুড় খাইতে পাইয়া কী খুশির হাসি দেখিয়াছিলাম তার মুখে! কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ডাগর চোখ, একটু মেয়েলি ধরনের ভাবভঙ্গি, বছর তেরো-চৌদ্দ বয়সের সুশ্রী ছেলেটি; সংসারে বাপ নাই, মা নাই, কেহ কোথাও নাই, তাই সেই অল্প বয়সেই তাহাকে নিজের চেষ্টা নিজেকেই দেখিতে হয়...সংসারের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল আবার। মনে পড়ে সরল মহাজন ধাওতাল সাহুকে। আমার খড়ের বাংলোর কোণটাতে বসিয়া সে বড় বড় সুপারি জাঁতি দিয়া কাটিতেছে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ছোট কুঁড়েঘরের ধারে বসিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজু পাঁড়ে তিনটি মহিষ চরাইতেছে এবং আপন মনে গাহিতেছে—

দয়া হোই জি—

মহালিখারূপের পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল বনপ্রান্তরে বসন্ত নামিয়াছে, লবটুলিয়া বইহারের সর্বত্র হলুদ রঙের গোলগোলি ফুলের মেলা, দ্বিপ্রহরে তাম্রাভ রৌদ্রদগ্ধ দিগন্ত বালির ঝড়ে ঝাপসা, রাত্রে দূরে মহালিখারূপের পাহাড়ে আগুনের মালা, শালবনে আগুন দিয়াছে। কত অতিদরিদ্র বালক-বালিকা, নরনারী, কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন, গায়ক, কাঠুরে, ভিখারির বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। অন্ধকার প্রান্তরে খড়ের বাংলোয় বসিয়া বসিয়া বন্য শিকারির মুখে অদ্ভুত গল্প শুনিতাম, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে গভীর রাত্রিতে বন্য মহিষ শিকার করিতে গিয়া ডালপালা ঢাকা গর্তের ধারে বিরাটকায় বন্য মহিষের দেবতাকে তারা দেখিয়াছিল।

ইহাদের কথাই বলিব। জগতের যে পথে সভ্য মানুষের চলাচল কম, কত অদ্ভুত জীবনধারার স্রোত আপনমনে উপলবিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে সে পথে, তাহাদের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি আজও ভুলিতে পারি নাই।

কিন্তু আমার এ স্মৃতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনো ক্ষমা করিবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়।

তাই এই কাহিনির অবতারণা।



প্রথম পরিচ্ছেদ

১

পনেরো-ষোলো বছর আগেকার কথা। বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতায় বসিয়া আছি। বহু জায়গায় ঘুরিয়াও চাকুরি মিলিল না।

সরস্বতী-পূজার দিন। মেসে অনেকদিন ধরিয়া আছি তাই নিতান্ত তাড়াইয়া দেয় না, কিন্তু তাগাদার উপর তাগাদা দিয়া মেসের ম্যানেজার অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। মেসে প্রতিমা গড়াইয়া পূজা হইতেছে—ধুমধামও মন্দ নয়, সকালে উঠিয়া ভাবিতেছি আজ সব বন্ধ, দু-একটা জায়গায় একটু আশা দিয়াছিল, তা আজ আর কোথাও যাওয়া কোনো কাজের হইবে না, বরং তার চেয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াই।

মেসের চাকর জগন্নাথ এমন সময় একটুকরা কাগজ হাতে দিয়া গেল। পড়িয়া দেখিলাম ম্যানেজারের লেখা তাগাদার চিঠি। আজ মেসে পূজা-উপলক্ষ্যে ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, আমার কাছে দু-মাসের টাকা বাকি, আমি যেন চাকরের হাতে অন্তত দশটি টাকা দিই। অন্যথা কাল হইতে খাওয়ার জন্য আমাকে অন্যত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কথা খুব ন্যায্য বটে, কিন্তু আমার সম্বল মোটে দুটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা। কোনো জবাব না দিয়াই মেস হইতে বাহির হইলাম। পাড়ার নানা স্থানে পূজার বাজনা বাজিতেছে, ছেলেমেয়েরা গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছে, অভয় ময়রার খাবারের দোকানে অনেক রকম নতুন খাবার থালায় সাজানো—বড় রাস্তার ওপারে কলেজ হোস্টেলের ফটকে নহবত বসিয়াছে। বাজার হইতে দলে দলে লোক ফুলের মালা ও পূজার উপকরণ কিনিয়া ফিরিতেছে।

ভাবিলাম কোথায় যাওয়া যায়। আজ এক বছরের উপর হইল জোড়াসাঁকো স্কুলের চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছি—অথবা বসিয়া ঠিক

নাই, চাকুরির খোঁজে হেন মার্চেন্ট আপিস নাই, হেন স্কুল নাই, হেন খবরের কাগজের আপিস নাই, হেন বড় লোকের বাড়ি নাই—যেখানে অন্তত দশ বার না হাঁটাহাঁটি করিয়াছি, সকলেরই এক কথা, চাকুরি খালি নাই।

হঠাৎ পথে সতীশের সঙ্গে দেখা। সতীশের সঙ্গে হিন্দু হোস্টেলে একসঙ্গে থাকিতাম। বর্তমানে সে আলীপুরের উকিল, বিশেষ কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না, বালিগঞ্জের ওদিকে কোথায় একটা টিউশনি আছে, সেটাই সংসারসমুদ্রে বর্তমানে তাহার পক্ষে ভেলার কাজ করিতেছে। আমার ভেলা তো দূরের কথা, একখানা মাস্তুল-ভাঙা কাঠও নাই, যতদূর হাবুডুবু খাইবার তাহা খাইতেছি—সতীশকে দেখিয়া সেকথা আপাতত ভুলিয়া গেলাম। ভুলিয়া গেলাম তাহার আর একটা কারণ, সতীশ বলিল—এই যে, কোথায় চলেছ সত্যচরণ? চলো হিন্দু হোস্টেলের ঠাকুর দেখে আসি—আমাদের পুরনো জায়গাটা। আর ওবেলা বড় জলসা হবে—এসো। ওয়ার্ড সিক্সের সেই অবিনাশকে মনে আছে, সেই যে ময়মনসিংহের কোন জমিদারের ছেলে, সে যে আজকাল বড় গায়ক। সে গান গাইবে, আমায় আবার একখানা কার্ড দিয়েছে—তাদের এস্টেটের দু-একটা কাজকর্ম মাঝে মাঝে করি কিনা। এসো, তোমায় দেখলে সে খুশি হবে।

কলেজে পড়িবার সময়, আজ পাঁচ-ছয় বছর আগে, আমোদ পাইলে আর কিছু চাহিতাম না—এখনও সে মনের ভাব কাটে নাই দেখিলাম। হিন্দু হোস্টেলে ঠাকুর দেখিতে গিয়া সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইলাম। কারণ আমাদের দেশের অনেক পরিচিত ছেলে এখানে থাকে, তাহারা কিছুতেই আসিতে দিতে চাহিল না। বলিলাম—বিকেলে জলসা হবে, তা এখন কী! মেস থেকে খেয়ে আসব এখন।

তাহারা সে কথায় কর্ণপাত করিল না।

কর্ণপাত করিলে আমাকে সরস্বতী-পূজার দিনটা উপবাসে কাটাইতে হইত। ম্যানেজারের অমন কড়া চিঠির পরে আমি গিয়া মেসের লুচি পায়েসের ভোজ খাইতে পারিতাম না—যখন একটা টাকাও দিই নাই। এ বেশ হইল—পেট ভরিয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া বৈকালে জলসার আসরে গিয়া বসিলাম। আবার তিন বৎসর পূর্বের ছাত্র-জীবনের উল্লাস ফিরিয়া আসিল—কে মনে রাখে—যে চাকুরি পাইলাম কি না-পাইলাম, মেসের ম্যানেজার মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া আছে কি না-আছে। ঠুংরি ও কীর্তনের

সমুদ্রে তলাইয়া গিয়া ভুলিয়া গেলাম যে দেনা মিটাইতে না পারিলে কাল সকাল হইতে বায়ুভক্ষণের ব্যবস্থা হইবে। জলসা যখন ভাঙিল তখন রাত এগারোটা। অবিনাশের সঙ্গে আলাপ হইল, হিন্দু হোস্টেলে থাকিবার সময় সে আর আমি ডিবেটিং ক্লাবের চাঁই ছিলাম—একবার স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা সভাপতি করিয়াছিলাম। বিষয় ছিল, "স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত"। অবিনাশ প্রস্তাবকর্তা আমি প্রতিবাদী-পক্ষের নায়ক। উভয় পক্ষের তুমুল তর্কের পরে সভাপতি আমাদের পক্ষে মত দিলেন। সেই হইতে অবিনাশের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হইয়া যায়—যদিও কলেজ হইতে বাহির হইয়া এই প্রথম আবার তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ।

অবিনাশ বলিল—চলো, আমার গাড়ি রয়েছে—তোমাকে পৌঁছে দিই। কোথায় থাকো?

মেসের দরজায় নামাইয়া বলিল—শোনো, কাল হ্যারিংটন স্ট্রিটে আমার বাড়িতে চা খাবে বিকেল চারটের সময়। ভুলো না যেন। তেত্রিশের দুই। লিখে রাখো তো নোট-বইয়ে।

পরদিন খুঁজিয়া হ্যারিংটন স্ট্রিট বাহির করিলাম, বন্ধুর বাড়িও বাহির করিলাম। বাড়ি খুব বড় নয়, তবে সামনে পিছনে বাগান। গেটে উইস্টারিয়া লতা, নেপালি দারোয়ান ও পিতলের প্লেট। লাল সুরকির বাঁকা রাস্তা—রাস্তার এক ধারে সবুজ ঘাসের লন, অন্য ধারে বড় বড় মুচুকুন্দ চাঁপা ও আমগাছ। গাড়িবারান্দায় বড় একখানা মোটর গাড়ি। বড় লোকের বাড়ি নয় বলিয়া ভুল করিবার কোনো দিক হইতে কোনো উপায় নাই। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই বসিবার ঘর। অবিনাশ আসিয়া আদর করিয়া ঘরে বসাইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন দিনের কথাবার্তায় আমরা দুজনেই মশগুল হইয়া গেলাম। অবিনাশের বাবা ময়মনসিংহের একজন বড় জমিদার, কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতার বাড়িতে তাঁহার কেহই নাই। অবিনাশের এক ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষ্যে গত অগ্রহায়ণ মাসে দেশে গিয়াছিলেন—এখনও কেহই আসেন নাই।

একথা ওকথার পর অবিনাশ বলিল—এখন কী করছ সত্য?

বলিলাম—জোড়াসাঁকো স্কুলে মাস্টারি করতুম, সম্প্রতি বসেই আছি একরকম। ভাবছি আর মাস্টারি করব না। দেখছি অন্য কোনো দিকে যদি—দু-এক জায়গায় আশাও পেয়েছি।

আশা পাওয়ার কথা সত্য নয়, কিন্তু অবিনাশ বড় লোকের ছেলে, মস্ত বড় এস্টেট ওদের। তাহার কাছে চাকুরির উমেদারি করিতেছি এটা না দেখায়, তাই কথাটা বলিলাম।

অবিনাশ একটুখানি ভাবিয়া বলিল—তোমার মতো একজন উপযুক্ত লোকের চাকুরি পেতে দেরি হবে না অবিশ্যি। আমার একটা কথা আছে, তুমি তো আইনও পড়েছিলে—না?

বলিলাম—পাসও করেছি, কিন্তু ওকালতি করবার মতিগতি নেই।

অবিনাশ বলিল—আমাদের একটা জঙ্গল-মহাল আছে পূর্ণিয়া জেলায়। প্রায় বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘে জমি। আমাদের সেখানে নায়েব আছে কিন্তু তার ওপর বিশ্বাস করে অত জমি বন্দোবস্তের ভার দেওয়া চলে না। আমরা একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছি। তুমি যাবে?

কান অনেক সময় মানুষকে প্রবঞ্চনা করে জানিতাম। অবিনাশ বলে কী! যে চাকুরির খোঁজে আজ একটি বছর কলিকাতার রাস্তাঘাট চষিয়া বেড়াইতেছি, চায়ের নিমন্ত্রণে সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে সেই চাকুরির প্রস্তাব আপনা হইতে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল?

তবুও মান বজায় রাখিতে হইবে। অত্যন্ত সংযমের সহিত মনের ভাব চাপিয়া উদাসীনের মতো বলিলাম—ও! আচ্ছা ভেবে বলব। কাল আছ তো?

অবিনাশ খুব খোলাখুলি ও দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। বলিল—ভাবাভাবি রেখে দাও। আমি বাবাকে আজই পত্র লিখতে বসছি। আমরা একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছি। জমিদারির ঘুণ কর্মচারী আমরা চাইনে—কারণ তারা প্রায়ই চোর। তোমার মতো শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকের সেখানে দরকার। জঙ্গল-মহাল আমরা নূতন প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করব। ত্রিশ হাজার বিঘের জঙ্গল। অত দায়িত্বপূর্ণ কাজ কি যার-তার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়? তোমার সঙ্গে আজ আলাপ নয়, তোমার নাড়িনক্ষত্র আমি জানি। তুমি রাজি হয়ে যাও—আমি এখুনি বাবাকে লিখে অ্যাপয়েনমেন্ট লেটার আনিয়ে দিচ্ছি।

২

কী করিয়া চাকুরি পাইলাম তাহা বেশি বলিবার আবশ্যক নাই। কারণ এ গল্পের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সংক্ষেপে বলিয়া রাখি—অবিনাশের বাড়ির

চায়ের নিমন্ত্রণ খাইবার দুই সপ্তাহ পরে আমি একদিন নিজের জিনিসপত্র লইয়া বি এন ডব্লিউ রেলওয়ের একটা ছোট স্টেশনে নামিলাম।

শীতের বৈকাল। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ঘন ছায়া নামিয়াছে, দূরে বনশ্রেণির মাথায় মাথায় অল্প অল্প কুয়াশা জমিয়াছে। রেল-লাইনের দু-ধারে মটর-খেত, শীতল সান্ধ্য-বাতাসে তাজা মটরশাকের স্নিগ্ধ সুগন্ধে কেমন মনে হইল যে জীবন আরম্ভ করিতে যাইতেছি তাহা বড় নির্জন হইবে, এই শীতের সন্ধ্যা যেমন নির্জন, যেমন নির্জন এই উদার প্রান্তর আর ওই দূরের নীলবর্ণ বনশ্রেণি, তেমনি।

গরুর গাড়িতে প্রায় পনেরো-ষোলো ক্রোশ চলিলাম সারারাত্রি ধরিয়া—ছইয়ের মধ্যে কলিকাতা হইতে আনীত কম্বল র‍্যাগ ইত্যাদি শীতে জল হইয়া গেল—কে জানিত এসব অঞ্চলে ভয়ানক শীত! সকালে রৌদ্র যখন উঠিয়াছে, তখনও পথ চলিতেছি। দেখিলাম জমির প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে—প্রাকৃতিক দৃশ্যও অন্য মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—খেতখামার নাই, বস্তি লোকালয়ও বড়-একটা দেখা যায় না—কেবল ছোটবড় বন, কোথাও ঘন, কোথাও পাতলা, মাঝে মাঝে মুক্ত প্রান্তর, কিন্তু তাহাতে ফসলের আবাদ নাই।

কাছারিতে পৌঁছিলাম বেলা দশটার সময়। জঙ্গলের মধ্যে প্রায় দশ-পনেরো বিঘা জমি পরিষ্কার করিয়া কতকগুলি খড়ের ঘর, জঙ্গলেরই কাঠ, বাঁশ ও খড় দিয়া তৈরি—ঘরে শুকনো ঘাস ও বন-ঝাউয়ের সরু গুঁড়ির বেড়া, তাহার উপর মাটি দিয়া লেপা।

ঘরগুলি নতুন তৈরি, ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই টাটকা-কাটা খড়, আধকাঁচা ঘাস ও বাঁশের গন্ধ পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আগে জঙ্গলের ওদিকে কোথায় কাছারি ছিল, কিন্তু শীতকালে সেখানে জলাভাব হওয়ায় এই ঘর নতুন বাঁধা হইয়াছে, কারণ পাশেই একটা ঝরনা থাকায় এখানে জলের কষ্ট নাই।

৩

জীবনের বেশির ভাগ সময় কলিকাতায় কাটাইয়াছি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, লাইব্রেরি, থিয়েটার, সিনেমা, গানের আড্ডা—এসব ভিন্ন জীবন কল্পনা করিতে পারি না—এ অবস্থায় চাকুরির কয়েকটি টাকার খাতিরে যেখানে আসিয়া পড়িলাম, এত নির্জন স্থানের কল্পনাও কোনোদিন করি নাই। দিনের

পর দিন যায়, পূর্বাকাশে সূর্যের উদয় দেখি দূরের পাহাড় ও জঙ্গলের মাথায়, আবার সন্ধ্যায় সমগ্র বনঝাউ ও দীর্ঘ ঘাসের বনশীর্ষ সিঁদুরে রঙে রাঙাইয়া সূর্যকে ডুবিয়া যাইতে দেখি—ইহার মধ্যে শীতকালের যে এগারো-ঘণ্টা ব্যাপী দিন, তা যেন খাঁ-খাঁ করে শূন্য, কী করিয়া তাহা পুরাইব, প্রথম প্রথম সেইটা আমার পক্ষে হইল মহাসমস্যা। কাজকর্ম করিলে অনেক করা যায় বটে, কিন্তু আমি নিতান্ত নব আগন্তুক, এখনও ভালো করিয়া এখানকার লোকের ভাষা বুঝিতে পারি না, কাজের কোনো বিলিব্যবস্থাও করিতে পারি না, নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া, যে কয়খানি বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম তাহা পড়িয়াই কোনো রকমে দিন কাটাই। কাছারিতে লোকজন যারা আছে তারা নিতান্ত বর্বর, না বোঝে তাহারা আমার কথা, না আমি ভালো বুঝি তাহাদের কথা। প্রথম দিন-দশেক কী কষ্টে যে কাটিল! কতবার মনে হইল চাকুরিতে দরকার নাই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভালো। অবিনাশের অনুরোধে কী ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া, এ জীবন আমার জন্য নয়।

রাত্রিতে নিজের ঘরে বসিয়া এই সবই ভাবিতেছি, এমন সময় ঘরের দরজা ঠেলিয়া কাছারির বৃদ্ধ মুহুরি গোষ্ঠ চক্রবর্তী প্রবেশ করিলেন। এই একমাত্র লোক যাহার সহিত বাংলা কথা বলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। গোষ্ঠবাবু এখানে আছেন অন্তত সতেরো-আঠারো বছর। বর্ধমান জেলায় বনপাশ স্টেশনের কাছে কোন গ্রামে বাড়ি। বলিলাম, বসুন গোষ্ঠবাবু—

গোষ্ঠবাবু অন্য একখানা চেয়ারে বসিলেন। বলিলেন—আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম নিরিবিলি, এখানকার কোনো মানুষকে বিশ্বাস করবেন না। এ বাংলাদেশ নয়। লোকজন সব বড় খারাপ—

—বাংলাদেশের মানুষও সবাই যে খুব ভালো, এমন নয় গোষ্ঠবাবু—

—সে আর আমার জানতে বাকি নেই, ম্যানেজারবাবু। সেই দুঃখে আর ম্যালেরিয়ার তাড়নায় প্রথম এখানে আসি। প্রথম এসে বড় কষ্ট হতো, এ জঙ্গলে মন হাঁপিয়ে উঠত—আজকাল এমন হয়েছে, দেশ তো দূরের কথা, পূর্ণিয়া কি পাটনাতে কাজে গিয়ে দুদিনের বেশি থাকতে পারিনে।

গোষ্ঠবাবুর মুখের দিকে সকৌতুকে চাহিলাম—বলে কী!

জিজ্ঞাসা করিলাম—থাকতে পারেন না কেন? জঙ্গলের জন্য মন হাঁপায় নাকি?

গোষ্ঠবাবু আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন, ঠিক তাই, ম্যানেজারবাবু। আপনিও বুঝবেন। নতুন এসেছেন কলকাতা থেকে, কলকাতার জন্যে মন উড়ুউড়ু করছে, বয়সও আপনার কম। কিছুদিন এখানে থাকুন। তারপর দেখবেন।

—কী দেখব?

—জঙ্গল আপনাকে পেয়ে বসবে। কোনো গোলমাল কি লোকের ভিড় ক্রমশ আর ভালো লাগবে না। আমার তাই হয়েছে মশাই। এই গত মাসে মুঙ্গের গিয়েছিলাম মোকদ্দমার কাজে—কেবল মনে হয় কবে এখান থেকে বেরুব।

মনে মনে ভাবিলাম, ভগবান সে দুরবস্থার হাত থেকে আমায় উদ্ধার করুন। তার আগে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কোনকালে কলকাতায় ফিরিয়া গিয়াছি!

গোষ্ঠবাবু বলিলেন, বন্দুকটা রাত-বেরাত শিয়রে রেখে শোবেন, জায়গা ভালো নয়। এর আগে একবার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। তবে আজকাল এখানে আর টাকাকড়ি থাকে না, এই যা কথা।

কৌতূহলের সহিত বলিলাম, বলেন কী! কতকাল আগে ডাকাতি হয়েছিল?

—বেশি না। এই বছর আট-নয় আগে। কিছুদিন থাকুন, তখন সব কথা জানতে পারবেন। এ অঞ্চল বড় খারাপ। তাছাড়া এই ভয়ানক জঙ্গলে ডাকাতি করে মেরে নিলে দেখবেই বা কে?

গোষ্ঠবাবু চলিয়া গেলে একবার ঘরের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দূরে জঙ্গলের মাথায় চাঁদ উঠিতেছে—আর সেই উদীয়মান চন্দ্রের পটভূমিকায় আঁকাবাঁকা একটা বনঝাউয়ের ডাল ঠিক যেন জাপানি চিত্রকর হাকুসাই-অংকিত একখানি ছবি।

চাকুরি করিবার আর জায়গা খুঁজিয়া পাই নাই! এসব বিপজ্জনক স্থান, আগে জানিলে কখনোই অবিনাশকে কথা দিতাম না।

দুর্ভাবনা সত্ত্বেও উদীয়মান চন্দ্রের সৌন্দর্য আমাকে বড় মুগ্ধ করিল।